শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীকে, সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অ্যাল্বার্ট আইনস্টাইন্ এবং সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা নিশ্চয়ই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর বা গুরুদেবের সঙ্গে মহাত্মার (পরস্পরকে এই সম্বোধনেই ডাকতেন তাঁরা) পারস্পরিক সম্পর্ক সমগ্র মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরল, শিক্ষণীয় এবং অবশ্যই উপভোগ্য নিদর্শন। 'রতনে রতন চেনে' এই বাংলা প্রবাদটির সদর্থক রূপটি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে কালজয়ী, অন্তঃঐশ্বর্য্যে ভরপুর, জগদ্বিখ্যাত এই দুই মহামানব ও সৃষ্টিকর্তার একে অপরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসায়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীবোদ্ধা প্রায় নেই বললেই চলে এবং তা কেবল গান্ধীজীর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয়, তাঁর সুউচ্চ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমগ্র জীবন, দুর্জয় সাহস ও সকলের কল্যাণে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গও কবিকে গভীরভাবে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল এবং বক্তৃতা ও লেখায় নানাভাবে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। এটি সত্য যে মহাত্মাজী সম্বন্ধে কারও কারও অসহিষ্ণুতা তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করেছে এবং প্রয়োজনে তাঁদের তিনি তিরস্কারও করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য সুভাষচন্দ্র বসুর (তখনও তিনি 'নেতাজী' হননি) লিখিত মন্তব্য........"আপনি (রবীন্দ্রনাথ) সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছেন" এর প্রত্যুত্তরে কবিগুরুর চিঠি "...... এই উপলক্ষে একটা কথা তোমাকে বলা আবশ্যক মনে করি। মহাত্মা গান্ধী অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে নিয়ে যেতে পেরেছেন......... মহাত্মাজীর চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিক শক্তিকে ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেইটিকে বলব অন্ধতা.........". ('রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র', নেপালচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৫০-৫৩ এবং 'গান্ধীজী ও নেতাজী', ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২০১-২০২)।

গান্ধীজীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধা ভালবাসা একমুখী ছিল না। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্রের 'মহানিষ্ক্রমণ' এর একমাত্র সঙ্গী তথা ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিশির কুমার বসু গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা এই বিষয়ে খুব ব্যঞ্জনাময়। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সময় গান্ধীজী কলকাতায় এসেছেন এবং শরৎচন্দ্র বসুর ১নং উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে উঠেছেন। তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই জোড়াসাঁকো থেকে গান্ধীজীকে দেখতে এলেন। কথাবার্তা হল, রবীন্দ্রনাথ যাবেন। গান্ধীজী বাইরে থেকে রবীন্দ্রনাথের জুতোজোড়া এনে তাঁকে নিজে হাতে পরিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মদিবস উদযাপিত হল সমগ্র বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি 'গোল্ডেন্ বুক্ অব্ টেগোর' ('Golden Book of Tagore') প্রকাশনার মাধ্যমে। প্রথম লেখাটিই গান্ধীজীর - "কবি জনোচিত প্রতিভা ও জীবনের অসাধারণ পবত্রতার দ্বারা যিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের শ্রদ্ধার আসনে উন্নীত করেছেন, হাজার হাজার দেশবাসীর মত, আমিও তাঁর কাছে ঋণী - আমার ঋণ আরও বেশী......"। ১৯৩২ সালের ২৫ মার্চ গান্ধীজী বলছেন - "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা যতই বলি না কেন তা পর্যাপ্ত হবে না। তাঁর মত উন্নত প্রতিভাশালী মানুষ সমগ্র জগতে কেউ আছেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে।" ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবিগুরু কালিম্পঙে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও কলকাতায় চলে এলেন। দুদিন পরে গান্ধীজীর শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে তাঁর একান্ত সচিব মহাদেব ভাই দেশাই জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজীর চিঠি পড়ে কবিগুরুর দুচোখ বেয়ে জলধারা নেমে এলো। গান্ধীজী আবার লিখলেন ".......মানবতা আপনাকে চায়, আপনি আরও কিছুদিন থাকুন।" ১৯৪১ সালের ৭ আগষ্ট রথীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ। কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজী

লিখলেন "..........তুমি যা হারালে আমিও তাই হারালাম, না সমগ্র জাতি, জাতি কেন সারা জগত তা হারালো।"

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে কবিগুরু এলেন আমেদাবাদে সবরমতী আশ্রমে। সেখানে এক ভাষণে বললেন ".......মহাত্মাজীর বাণী বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব মহাত্মাকে বিশ্বকর্মা বলা যাইতে পারে।" পরে লিখলেন - "মহাত্মা অনেককে বলা হয় তার কোন মানে নেই।......কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে তার মানে আছে।......আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্তলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা, সেই প্রেমের ঐশ্বর্য্য দেবাৎ মেলে.......(৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯)।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর অমিল ছিল না! অনেক ক্ষেত্রেই ছিল, তবে মিল ছাপিয়ে গিয়েছিল অমিলকে, মতানৈক্যকে। ১৩৩২ সালের ভাদ্রমাসে 'চরকা' প্রবন্ধে কবিগুরু লিখছেন - "মহাত্মাজীর সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমরা মতের বা কর্যাপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মত আনন্দ আর কি হতে পারে? তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় শক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষবার যখন গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন এক জনসভায় বলেছিলেন যে তাঁর ও গুরুদেবের মধ্যে অমিলের খোঁজ তিনি করেছেন। কিন্তু তাঁর এই পবিত্র উপলব্ধি হয়েছে যে তাঁর ও গুরুদেবের মধ্যে কোন অমিলই ছিল না। একথা অবশ্য অনেক পূর্বে, ১৯২৫ সালের ৫ নভেম্বর তাঁর ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় 'কবি ও চরকা' শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ ও তিনি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

১৯৩৯-১৯৪০ সালে তথাকথিত গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র বিতর্কের সময়ে কি চমৎকারভাবে গান্ধীজীর যুক্তি অনুধাবন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত কবি ও এক সময়ে তাঁর সচিব অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ ২০-০৫-১৯৩৯ তারিখের একটি পত্রে লিখেছেন - "বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বতন্ত্রদানের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজির মনে একটি বিশেষ সঙ্কল্প বাঁধা রয়েছে। মনে মনে তাঁর পথের একটি ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে কোন বিপরীত মতবাদের অভিঘাতে তাঁর সঙ্কল্প ক্ষুন্ন হয় এ আশংকা তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক। হয়তো মহাত্মাজীর সৃজনশালায় আরও অনেক মূল্যবান নূতন উপকরণ যোগ করার প্রয়োজন আছে। এই যোগ করা যদি ধৈর্য্যের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতায় না ঘটে তা হলে সমগ্রেরই ক্ষতি। এ অবস্থায় মূল সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করতেই হবে। দেশের সৌভাগ্য ক্রমে দৈবাৎ যদি এমন শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয় যাঁর প্রভাব সকলের ওপর, তবে তাঁকে তাঁর পথ ছেড়ে দিতেই হবে, তাঁর ধারাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারবে না।..."

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর পারস্পরিক এই সম্পর্ক দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। প্রথমটি ১৯৩২ সালের ১৭ আগষ্ট কুখ্যাত "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" বা তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর 'ম্যাকডোনাল্ড্ এডওয়ার্ড' এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল বিশ্বভারতীকে গান্ধীজীর হাতে অর্পণ করে তার স্থায়িত্ব বিষয়ে নিশ্চিন্ততা।

১৯৩১ সালের শেষার্ধে ২য় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯৩২ সালে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ও ব্রিটিশ সরকার প্রচন্ড দমননীতি গ্রহণ করে। এর পাশাপাশি বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড 'কম্যুনাল এওয়ার্ড' বা 'সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করেন। এর দ্বারা অনুন্নত হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে একটি বিভেদের চেষ্টা হয়। গান্ধীজী এর কুফলটি বুঝতে পারেন ও এর বিরুদ্ধে বা প্রতিরোধ ও রদ করার জন্য ঐ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। তিনি তখন বন্দী অবস্থায় পুনার এড়োরা কারাগারে।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর স্বপক্ষে গর্জে উঠলেন। ৪ আশ্বিন ১৩৩৯, শান্তিনিকেতনে এক সভায় বললেন...."..... সূর্যের পূর্ণ গ্রাসের লগ্ন যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করেছে। এমন সর্ব্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে আর ঘটেনি।....যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থভাবে, গভীরভাবে আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন....।"

"....জয় হোক সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর। বলো তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।"

২৬ সেপ্টম্বর ১৯৩২, কবিগুরু স্বয়ং পৌঁছে গেলেন এড়োরা কারাগারে, অসুস্থ শরীরে, বৃদ্ধ বয়সে, মহাত্মা যে তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছেন। সেই চরম কথাটি গুরুদেব ব্যক্ত করলেন...."আমরা একজন মানুষের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম, মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে আমরা সেই রকম ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাই....। অবশেষে 'পুণা চুক্তি'র মাধ্যমে একটি আপোষ মীমাংসার পরে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন ও তাঁর অনুরোধে তাঁর শিয়রে বসে রবীন্দ্রনাথ স্বকণ্ঠে "জীবন যখন শুকায় যায়...." সঙ্গীতটি গান্ধীজীকে গেয়ে শোনালেন। গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গের পরবর্তী পর্যায়টি রবীন্দ্রনাথ অপূর্বভাবে তাঁর মর্মস্পর্শী লেখনীতে মূর্ত করেছেন এইভাবে - "জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটেনি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা" (মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৬১)।

পুণা থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ 'চন্ডালিকা' গীতিনাট্য লিখলেন ও "হে মোর দুর্ভাগা দেশ" কবিতাটির রচনা করলেন।

এর পরে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। গুরুদেবের জীবদ্দশায় মহাত্মাজীর শেষবার শান্তিনিকেতন ভ্রমণ। রাত্রে যে ঘরে গান্ধীজী শয্যা গ্রহণ করবেন সেই ঘরে কবি নিয়ে গেলেন তাঁকে। আয়োজনে অভিভূত গান্ধীজী বলে উঠলেন...."এ তো বাসর ঘর, কনে কোথায়!" রবীন্দ্রনাথ বললেন - "কনে আছে।" ফেরার সময় হল। ১৯৪০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী। গান্ধীজী গাড়িতে উঠবেন। কবি তাঁকে দিলেন খামে মোড়া একটি পত্র, বললেন - "গাড়ীতে পড়বেন।" গান্ধীজী দেখেন কবি লিখেছেন - "বিশ্বভারতী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। আমি এখন অন্য পথের যাত্রী। এর স্থায়িত্বের ভার আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম।"

আমার মনে হয়েছে গান্ধীজীর মানস পুরুষ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'একাদশ ব্রত' এমন কি 'অস্বাদ ব্রত', 'অছিবাদ' নিয়েও।